পাহাড়ের রাজা পাহাড় সিং

- শংকরী মণ্ডল

পাহাড় সিংকে মনে পড়ছে। পাহাড় সিং, এক মাতাল। মহুয়া গেলা মাতাল পাহাড় সিং। আমিও সেদিন মাতাল ছিলাম। না মহুয়া, না হাড়িয়া, না বিদেশি মদ, তবু চেতনা শক্তিরহিত এক মাতাল। পাহাড়সিং চিনে ফেললো ঠিক। জাত চেনে ব্যাটা। আবোল তাবোল বকতে থাকে, পাশে এসে। আর জমে যাওয়া অথর্ব নেশাটাকে কেমন বদলে খুশিতে ভরিয়ে দিল আমায়।

আজ নীহারিকা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে খুঁজছি মানুষটাকে, কোথাও আছে কিনা।

নীহারিকা হোটেল, পুরুলিয়ার হিলটপে। এখানেই তো, এখানে আমার অটোর পাশে দাঁড়িয়ে, প্রেমিক-প্রেমিক দীনতা নিয়ে, আমাকে খুশি করার ব্রত নিয়েছিল সে। আর কী আশ্চর্য! আত্মবিশ্বাসে অভাব ছিলো না কোনও। একগুচ্ছ বোগেনভোলিয়া সে আমায় দেবেই। তা এমন এক দিনে কাগুজে ফুলের তোড়াটি সে দিয়েছিলো আমায়। সেটি অনিমেষ ফুটে আছে আজও... অটো হাঁকিয়েছিল আমার দল, কিন্তু আশ্চর্য, চিরকালের মতো স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে সে মাতাল, পাহাড়সিং, এইখানে। পাহাড়সিং, পাহাড়ের রাজা পাহাড় সিং। তেমনই তো বলেছিলো সে, সেইই অযোধ্যা পাহাড়ের রাজা। সেই জায়গাতেই তো দাঁড়িয়েছি। রাজাকেও সবার চেনার কথা, তবু খুঁজে পাচ্ছিনা কেন তাকে? মাতাল নই বলে?

"পাহাড় সিং, আর একবার দেখা দে, আজ সারা দুপুর কথা হবে। ওই রইলো গাড়ি, বসলাম এই বসন্তের অগণন কুঁড়ি ভরা কাঁঠাল গাছের বাঁধানো বেদিতে, বিরসা-ময়দানের এক কোণায়। জানিস, সারা সকাল মহুয়া কুঁড়িয়েছি আজ, শুকোতে দিয়ে এসেছি মাটির উঠোনে

কাগজ বিছিয়ে। কিন্তু তারপর? কী ক'রে বানায় মহুয়ার মদ, তা তো জানি না। শিখবো তোর কাছে। রস টইটম্বুর ফল কুড়িয়েই মুখে দিয়েছি কয়েকটা। ভালো লাগেনি। তোর সেদিনের সম্ভ্রমের দৃষ্টির সামনে বসে, আজ এই আমি, মহুয়ায় ঘ্রাণে বিশুদ্ধ মাতাল হতে রাজি..."

না, খুঁজে পেলাম না। মনে হচ্ছে, রাজাকে হারিয়ে ফেলেছি। আর একটু অপেক্ষা করা যায়। সবাই খেতে ঢুকেছে 'জামাই হোটেল'-এ। আমার পেট ভর্ত্তি সিরকাবাদের বিখ্যাত আখবাগান থেকে সদ্য-তোলা আখের তিন তিন গ্লাস রস। অযোধ্যায় ওঠার একটা রাস্তা সিরকাবাদ। সিরকাবাদের সিল্করুট। সব ঠিক আছে। কিন্তু রাজাকে না পেলে কত কী অপূর্ণ থেকে যাবে আজ। পায়চারি করতে থাকি। কেউ চেনে না তাকে? সেই রাজাকে, নিজেকে যে চিনেছিলো আপন অস্তিত্বের পারে গিয়ে মহুয়ায় ডুবে - কেউ চেনে না তাকে?

এইখানে আছে হস্তশিল্পের সম্ভার। আছে একটা দারুণ গাইড ম্যাপ, পাহাড়-রাজার রাজ্যের। আমি নেট থেকে যার ভাসা ভাসা প্রিন্ট নিয়ে এসেছি। এখানে এই দেখলাম একটা এটিএম কাউন্টার। দারুণ সচল। মাঠের ওপারে স্টেডিয়ামের পিছনে আছে প্রসাধনীগৃহ। বেশ পরিষ্কার । আর একটা জায়গা আমি চিনি, যেখানে অনুপস্থিত পাহাড়ের রাজার অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম সেদিন। ময়ূর পাহাড়। ময়ূর পাহাড়, অযোধ্যা হিল টপ থেকে সামান্য দূরে, পাহাড়ের ওপরে আর এক পাহাড়। ওখানে উঠতে হবে। আধখানা পথ ওঠার পর সাদা ধূসর গালিচা, যেন পাহাড়-ঢালে স্লিপ খেয়ে নিচে নেমে গেছে। একটু এদিক ওদিক হলে গভীরে

গড়িয়ে যাওয়া যায়। দেখা যায় অনেক দূর। শিরে পা ঝুলিয়ে বসলে কণ্ঠে কবিতা ভর করে, আকাশ নিনাদিত হয়। গলায় সুর তুলে বন পাহাড়ের উপর দিয়ে বইয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দূর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে পারে সেই সুর।

পাহাড়শিরে পাহাড় তার পাহাড়ি চরিত্র হারিয়েছে। এখানে সে অনেক বেশি সমতল। যেন বারবার জমি হারানো ভূমি সন্তানদের একটু আরাম দিতে চায়। এখনও আইন তাই বলে। হ্যাঁ, তাই বলে আইন। পাহাড় এখানকার, আদিবাসী আর তপসিলীদের। কিন্তু নীহারিকা, মালবিকা আর যত হোটেল, এজেন্সি, গাড়ির ড্রাইভার, পাহাড় ঘিরে গড়ে ওঠা ব্যবসা বা রাজনীতি, এসবের কতটুকু সেই আদিবাসীদের বা তপসিলীদের জন্যে? ওদের বুভুক্ষার ছবি সংস্কৃতির নামে পণ্য হয় পুরুলিয়ায়, মিলনমেলায়, ফেসবুকে। পাহাড়ময় সে ছবিই তো দেখছি।

ময়ূরপাহাড় পেরিয়ে ঐ যে মেয়েটা, ছেলে কোলে ওপারের পাহাড়ে যাচ্ছে, আর দুটি বছর দুই-তিনের শিশু, উদোম গায়ে, খালি পায়ে ছুটছে পিছন পিছন। আর, ওই যে ভরদুপুরে, গোবরকুড়ানি বৃদ্ধা, ওই যে সন্তানকোলে কিশোরী মায়ের পিছনে, ভাতের থালা আগলে চলা বছর তিনের শিশু ...। ওইসব ছবি মনকে যা বোঝায় তা কি মিথ্যে? কতদূর হাঁটবে ওরা? কতটা ওরা হাঁটে সারাদিন? ওদের শরীরে অবশ্য মেদ নেই। সুগার কি আছে?

ওই যে, পাহাড়সিং-এর সিংহাসন খুঁজে পেয়েছে দুষ্টু ছেলেদুটো। বসে পড়েছে। ওই ওরা তরতরিয়ে উঠছে উপরে।

'ওরে থাম থাম, সাবধান।' আর সাবধান। পথ যত সহজ, ততই বিপজ্জনক। ওই তো ওরা পৌঁছে গেছে উপরে। আর

আনন্দে চীৎকার করছে।

'ওরে বাবা, থাম। পাহাড়ে চিৎকার করতে নেই।' সে বিরক্ত হয়।

পায়ে পায়ে আমিও উঠে আসি। দুটো পাথর, ভিক্ট্রি স্ট্যান্ডের মতো সেজে আছে। সেদিন মনে হয়েছিলো, ওটাই যেন পাহাড়সিং-এর সিংহাসন। আজও তাই মনে হল। সেটি ছুঁয়ে উঠে এলাম আরও উপরে। এই সবই তার রাজসভা। পাহাড়শিরের সমতলে এই একটি জায়গা, যেখান থেকে চারপাশের তরঙ্গায়িত পাহাড় দেখা যায়। আহা! ভারি সুন্দর। চুড়োয় বিশাল এক পাথর, তার উপরে উঠে তৃপ্তিতে ভরে গেল মন। পাহাড়সিং-এর গোটা রাজ্য দেখছি দুচোখ ভরে। অযুতলক্ষ বোগেনভোলিয়ার গোলাপী রঙ সবখানে।

অবিরল জলধারা, সীতাকুণ্ডের...

ঘুরলাম সীতাকুণ্ড। আপাত সাধারণ। একটা ছোট্ট ঝোরা বাহিকার উৎসমুখে অত্যন্ত সাধারণ কুঁয়ো। দেখাই যায় না, গাড়ি থেকে নেমে ক-পা মাত্র দুরত্বে থাকা কুঁয়োটিকে, যদি কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দেয়, বা এক্কেবারে সাথে করে কুয়োর পাড়ে না নিয়ে যায়। অগভীর সেই কুঁয়োর বাঁধানো পাড়ে বসে পড়লো আমাদের দস্যিদুটো। হা হা করে উঠলো স্নানরতা মেয়েটি।

'কী থেক্-এঁ কী হইয়েঁ যায়..., সীতামাইয়ার কুঁয়ো ইঁটা...'

চমকে টেনে নিলাম বাচ্চাদের। ও যেন বলতে চাইলো, যদি অভিশাপ লাগে সীতা মাইয়ার। ওর বিশ্বাসের গভীরতা মুহূর্তে আমার যুক্তিবোধকে হারিয়ে দেয়, সে অন্য এক

অনুভব। গাইড বললেন, 'সীতামাইয়া, স্বামী-দেওরের সঙ্গে বনবাসে এসে জল খুঁজে পায়নি। লক্ষ্মণ তখন বাণ মেরে জল আনে।' সেই সত-নির্ঝরিত জলে আজও তৃষ্ণা মেটায় অযোধ্যার এই গ্রাম। আর ওই যে ওর পাড়ের মাটি, ওতে আজও মাথাব্যথায়, পেটব্যথায় নাকি আরাম পায় মানুষ। তা হবে। মা আমার কপালে মাখিয়ে দিল মাটি। আমি প্রণাম করলাম কুঁয়োর পাড়ে। কিন্তু কাকে প্রণাম? পুরাণ ছুঁয়ে আসা, না পুরাণ পেরিয়ে আসা প্রবাহকে? কত পুরোনো এই কুঁয়ো? হাত দেড়েক গভীর জলে ঝকঝকিয়ে চোখে পড়ে নীচের মাটি। জলস্তরের উপরতলে একটা ছোট্ট পাইপ, হাতখানেকের। সেই পাইপ দিয়ে কুঁয়ো থেকে অনিবার ধারায় পড়ছে জল। দিন-রাত্রি-মাস-বছর..... কোথা থেকে আসে এত জল গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে? সারা গাঁয়ের তৃষ্ণার জল শুধু নয়, সবরকম ভরসার সে জল। জানতে যাবো আবার, একা একা অনেক সময় নিয়ে একদিন, কত গ্রামের তেষ্টা মেটায় ঐ জল? আহা, এমন একটি জলের উৎস যদি থাকতো আমার গ্রামে...!

ফেরার পথে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী স্নানরতা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে সময় লাগলো অনেক। ফটো তোলা, নাম জানার সাহস হল না মোটেই। খানিক দূরে তার গ্রাম, রামমন্দিরের ওপরে তার বাড়ি। আলাপ জমাতে চাই,

'কী সুন্দর চুল গো তোমার ? কী দাও চুলে?'

'সরসের তেল দিই। ভালো তেল পাবো কই তুর মতো?'

'আমার চুলে? আমি তো তেল দিইনা গো।'

'দিস না!!' অবাক হয় সে।

'তোমাদের জলের কত কষ্ট।' সমব্যথী হতে চেয়ে বলি।

'না, হামদের জলের কুনও কষ্ট নাই। সারা পাড়ায় কুনও কষ্ট নাই।'

এরপর মুর্গুমা। মোহময়ী অপরূপা মুর্গুমার জলই ভরসা আশপাশের গ্রামগুলোর। বাসনমাজা, কাপড়কাচা, শৌচকর্ম – সব এই জলে। ওরাও বলে, 'কুনও কষ্ট নাই, সারা পাড়ায় কুনও কষ্ট নাই।' দেউলঘাটা সিরকাবাদ ধূসর জনপদ ঘুরে ঘুরে দেখলাম বটে, ত্রিসীমানায় জল না থাকা মানুষগুলোর কুনও কষ্ট নাই জলের। অনেক ঘুরলাম। চিত্র এক, চিত্রায়নও এক।

পরদিন সকালে পারডি গ্রাম, তার এক কিলোমিটার দূরে পারডি ড্যামে গেলাম। একদঙ্গল কন্যাশ্রীর সাইকেল দাঁড় করানো সেখানে। স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা স্নান করছে। কেউ বাসন মাজছে। কী জানি, ওদের এই নিত্য সংগ্রামের ছবি তুলতে কীরকম সংকুচিত হয় মন,

আর কী মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গেছে ওর কাছে? তবু দেশ চেনার, মানুষের দুঃখ চেনার সৌখিনতা থেকে বেরিয়ে আসে আক্ষেপ, 'জলের যে কী কষ্ট এখানে!'

তার শব্দবান তীব্রবেগে ছুটে আসে আমার দিকে, 'না, হামদের জলের কুনও কষ্ট নাই, সারা পাড়ায় কষ্ট নাই, কত্ত বাঁধ আছে, কত্ত জল আছে।'

কথাটা বারবার শুনতে শুনতে এবার হঠাৎ মরমে প্রবেশ করল। ধীর তীব্র প্রতিবাদ জোর ধাক্কা দেয়। সকাল থেকে পাহাড়সিং-কে খুঁজছিলাম। বুঝলাম চরম দীনতার দিনে কেমন করে সে আমায় ঐশ্বর্য দিয়েছিল। ওদের এই ঐশ্বর্য সীতাকুন্ডের প্রস্রবণের মতো, ফুরোয় না। ওদের অভাব নেই কুনও। ওরা সবাই রাজা। সবাই রাণি। আর যারা কেড়ে নিয়েছে নানা ফন্দিফিকির করে, বার বার, ওদের ভূমি অরণ্য, তারাই রয়ে গেল ভিখিরি। অভাব যাদের মজ্জায় মজ্জায়। আমিও তো তথাকথিত সভ্যদের দলে। শুধু অ্যাম্বিশন...,আরো আরো আরো চাই...

সেই আদেখলামোই চলে, কখনো দেশ দেখার ছলে, কখনো ব্যবসার অছিলায়, কখনো উন্নয়নের নামে। সে আজও চলছে। এই যে পলাশ দেখার নামে রিসর্টের পর রিসর্ট..., সেও পলাশ ভূমি গ্রাস করেই। যে জমি আলো করে ফোটে পলাশ, শিমুল, কুসুম। তাই নিয়ে চলে ব্যবসা, রমরমিয়ে।

ওরা সরল সাদামাটা মানুষ, ওরা চাইতে জানেনা, জটিলতা জানে না। ওরা পাহাড়সিং-এর জাত। যারা শুধু দিতে জানে, যারা চারপাশের হাজারো ভিখিরি ধান্দাবাজের মধ্যে সভ্যতার পিলসুজ হয়ে আছে। ওদের কুনও অভাব নাই।